কল্যাণ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ : দেরিদা

১

দেরিদা বিষয়ে কোনো কিছু বলার প্রধান সমস্যা হচ্ছে তাঁর বিস্তৃত প্রভাব, বিভিন্ন রুচির পাঠক মহলে তাঁর বক্তব্যের প্রবল অভিঘাত। শুধুমাত্র দার্শনিকের কাছেই নয়, তাঁর আবেদন সাহিত্যিক মহলেও সমানভাবে পৌঁছে গেছে। সুতরাং দেরিদা সম্পর্কে যে কোনো আদর্শ উপস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে দার্শনিক অথবা সাহিত্য সমালোচকের বিভিন্ন প্রবণতা বা মানসিকতা সেখানে সমভাবে আশ্রয় পায়। এই কাজ নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ। ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ে আরও একটি কারণে। সাহিত্য সমালোচকরা দেরিদাকে ততটুকুই ব্যবহার করেন যতটুকু তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য বা প্রবণতার সঙ্গে খাপ খায়। এঁরা দেরিদাকে সংস্থাপিত করেন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম-এর পটভূমিকায় এবং তিনি যে দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে বিভাজন রেখাটি তুলে দিয়েছেন— এই কথাই বারবার জোর দিয়ে বলতে ভালবাসেন। ফলে এঁদের আলোচনার কুহকে আমরা ক্রমশই ভুলতে থাকি, দেরিদা প্রথমত এবং প্রধানত একজন দার্শনিক। শিথিল অর্থে নয়, যথার্থ অর্থে। শুধু মেটাফর বা শুধু ভাষার মোহিনী মায়া নয়—তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ক্রমশই পরিস্ফুট হতে থাকে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিনির্ভর এক ধারণাগত কাঠামো। অন্যদিকে কোনো দার্শনিকের দেরিদা রূপায়ণ এতই বিমূর্ত ও গগনবিহারী যে সাহিত্যিক-মহল সেখানে ডানা মেলতে পারে না। ফলে দেরিদার দর্শনের মূলকেন্দ্রে এই মহল সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না।

এইসব অসুবিধের কথা স্মরণ রেখে আমাদের যেটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত তা হচ্ছে দেরিদার দর্শনকে যথার্থভাবে তুলে ধরা। কিন্তু এই কাজের প্রধান অন্তরায় দেরিদা নিজেই। তাঁর বক্তব্যের দার্শনিক অবয়বটি ঢাকা পড়ে যায় ভাষার বিচিত্র ও জটিল প্রয়োগের আড়ালে। এমন এক ভাষা যা কোনো অর্থেই সাধারণ নয়, যেখানে নানা ব্যঞ্জনা, বিন্যাস, সঙ্কেত, নানা সূক্ষ্মতার চমক, নানা শ্রাবন্তীর কারুকাজ ; এমন এক ভাষা যেখানে মেটাফর ও প্যারাডক্সের সমন্বয়— যার মধ্য দিয়ে আমাদের অতিপরিচিত সাধারণ পৃথিবীর মুখ দেখা যায় না। দেরিদা ভাষার সেই নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করেন, দার্শনিকরা বৌদ্ধিক কারণে যা বাতিল

করেন। ভাষার যে খেলায় তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন, প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলি সেখানে প্রশ্রয় পায় না। তাঁর বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ তর্কশাস্ত্রসম্মত; কিন্তু ভাষার এক বিশেষ বিস্তার ও সম্প্রসারণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের প্রচলিত দার্শনিক ধারণার সীমানা থেকে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু দেরিদার ভাষা প্রয়োগের এই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে আমরা অস্বস্তি বোধ করলেও এর যে কোনো মূল্য নেই এমন কথা বলা ঠিক হবে না। ভাষার এমন এক নিগূঢ় জটিল বিন্যাসের সঙ্গে ভিটগেনস্টাইনের পাঠকও সুপরিচিত। দার্শনিক ফিল্ডলের ভাষায়, এই 'magic of stylistic talkingness' প্রচলিত দার্শনিক ধারণার সংস্কার আলগা করে দিয়ে এক নতুন দিগন্তে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, দর্শনকে দেখায় নতুন আঙ্গিকে, পরিচিতের মধ্যে তুলে আনে অন্য এক পরিচয়।

সংক্ষেপে এই-ই হচ্ছে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন বা অবনির্মিতির কাজ। এটি দর্শনের এক বিশেষ পদ্ধতি যার প্রয়োগ জগতের উপর নয়, দর্শনের উপর। দর্শনের বিষয় জগৎ-চিন্তা, জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল বৌদ্ধিক রূপায়ণ। এর জন্য নানা বিচার বিশ্লেষণ, নানা নির্মাণ। কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। যা মেনে নিয়েছি বিনা বিচারে তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা। কোনো কিছু সম্ভব হয় কী করে—দার্শনিক যখন এই প্রশ্ন তোলেন তখন তার উত্তরের সূত্র ধরে আমরা উত্তীর্ণ হই অতি চেনা দৈনন্দিনতার অন্ধ অভ্যাস থেকে দূরে অন্য এক নতুন, অপরিচিত মাত্রায়। এই চেনার মধ্যে অচেনাকে তুলে ধরা—এই পরিক্রমায় অবশ্য দর্শন নিঃসঙ্গ নয়, কবিতাও তার সহযাত্রী। তবু কবিতা ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মূল প্রভেদ সর্বদাই থেকে যায়। দর্শন বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত, কবিতার বিশিষ্ট আবেগ ও অনুভবের দ্বারা সংক্রামিত নয়। বলা বাহুল্য যে দর্শনের কথা আমরা বলছি, দার্শনিক রর্টির ভাষায় তা হচ্ছে edifying philosophy : যার কাজ জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ভাবনা বা সংস্কারই যে শেষ কথা নয়, বস্তুত জগৎ-সম্পর্কিত যে কোনো ভাবনার মধ্যেই যে একটা অনিবার্য ফাঁক থেকে যায়— সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। একেই আমরা বলব ডিকনস্ট্রাকশন বা অবনির্মিতি। এই ডিকনস্ট্রাকশন দর্শন যা জগৎ-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, দেরিদা প্রয়োগ করেন দর্শনের উপর। তাই তাঁর অবনির্মিতি প্রাণ পায় দর্শনের প্রতি এক সুতীব্র মানসিকতায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন দর্শনের প্রচলিত রীতি, প্রচলিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে। দেরিদার এই দর্শনের বিরুদ্ধগামী ডিকনস্ট্রাকশন রীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভিটগেনস্টাইনের সেই মানুষদের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা যারা 'normally react to the gesture of pointing with the hand by looking in the direction of the line from finger-tip to wrist, not from wrist to finger-tip'

(Philosophical Investigations 185, Zettel 317 দ্রষ্টব্য)। এই অদ্ভুত ও অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে ভিটগেনস্টাইনও দেরিদার মতোই আমাদের অভ্যস্ত দার্শনিক ব্যবহারের উপর প্রশ্ন তোলেন। এই প্রচলিত দার্শনিক ধারার মধ্যে যারা লালিত তাদের কাছে দেরিদার এই পদ্ধতি এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। কিন্তু এর জন্য দেরিদা দায়ী নন। দায়ী আমাদের উপযুক্ত মানসিক প্রসারতার অভাব। যদি থাকে সেই প্রসারতা, সেই ঔদার্য, যদি মুক্ত হতে পারি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দৃঢ়মূল অভ্যাসের দাসত্ব থেকে তবে আমরা ধরতে পারি দেরিদার বক্তব্য, পৌঁছতে পারি সেই সত্যের কাছে যা দেরিদা আমাদের কাছে উন্মুক্ত করতে চান।

এবার দেরিদার এই অবনির্মিতির বিশিষ্ট সংস্থানের দিকে একটু তাকানো যাক। তাঁর অবনির্মিতি এক বিশেষ পঠন রীতি : বিষয়বস্তু দর্শন বিষয়ক টেক্সট। এই টেক্সট বলতে বোঝায় পাশ্চাত্য দর্শনের সমগ্র ধারা— যে প্রবাহ প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে হুসার্ল, হাইডেগার পর্যন্ত বিস্তারিত, যে প্রবাহ তৈরি করেছে 'One great discourse' (Margins, পৃ. 177)। এই পঠনরীতি পথ খুঁজে নেয় একটি দার্শনিক টেক্সট থেকে অন্য দার্শনিক টেক্সটে এবং প্রতিটি টেক্সটের মধ্যে যে significant structure শরীরী হয়ে উঠেছে তুলে ধরে তার অসম্পূর্ণতার ফাঁক। এই কারণে অবনির্মিতিকে বলা যায় 'radical incompleteness thesis'। কথাটি অন্যভাবেও বলা যায়। ডিকনস্ট্রাকশনের পঠনরীতি বা ভাষ্য সাধারণ-ভাষ্য থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ অর্থে interpretation বা ভাষ্যের কাজ একটি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সত্য বা অর্থ বিশদ করে তুলে ধরা, তুলে ধরা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য বা প্রেরণা, তাঁর বিশেষ অভিপ্রায়। কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন এর থেকে স্বতন্ত্র। কোনো গ্রন্থের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রাবিন্দুতে পৌঁছনো এর উদ্দেশ্য নয়; এটা নয়, ওটা : কোনো গ্রন্থের এই দ্বিধাহীন, নিশ্চিত ও অনড় সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পরিকল্পনা যে কত ভঙ্গুর তা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। দর্শনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সিদ্ধান্ত, রীতি ও বিশ্বাসের মধ্যে অসম্পূর্ণতার ব্যবধান অনাবৃত করাই অবনির্মিতির লক্ষ্য। এই অর্থে দেরিদার অবনির্মিতিবাদ দর্শনের প্যারাসাইট : দার্শনিক ঐতিহ্যের আশ্রয়ে সে পল্লবিত হয়। একমাত্র দর্শনের প্রসঙ্গে, কিন্তু দর্শনের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই অবনির্মিতিকে বোঝা যায়।

এই অবনির্মিতির সাধারণ চরিত্র দেরিদা নিজেই উদ্ঘাটিত করেছেন এইভাবে। তিনি তিনটি স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। (১) যে কোনো টেক্সটেই লক্ষ করা যায় দুটি ক্রম বা প্রত্যয়ের মধ্যে এক অসম দ্বন্দ্ব এবং এর মধ্যে একটি প্রত্যয়কে প্রাধান্য দেবার ঝোঁক। প্রথম পর্যায়ে অবনির্মিতির কাজ এই দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্যের চিহ্নিতকরণ।

(২) দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায়ে অবনির্মিত এই প্রাধান্যের মোড় উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে যেটিকে কোনো টেক্সটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার গৌরব খর্ব করে অবহেলিত বিরোধী প্রত্যয়ের মহিমা তুলে ধরা হয়। (৩) এবং তাকে দেওয়া হয় এমন এক নবতর ব্যঞ্জনা যার ফলে টেক্সটে যে মৌলিক সংঘাতের কথা ছিল তার শিকড় শিথিল হয়ে পড়ে। (Positions দ্রষ্টব্য)।

২

এই পদ্ধতি দেরিদার পঠনপ্রণালীতে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখা যাক। দেরিদার বিরুদ্ধে একটি বহু প্রচলিত ধারণা অথবা অভিযোগ আছে। তা হচ্ছে এই, তিনি তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ ব্যাখ্যায় নির্বিচার, অযৌক্তিক স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই অভিযোগ যে কত অসার দেরিদার যে কোনো পাঠকই তা জানেন। তিনি জানেন, হুসার্ল, রুশো অথবা অস্টিনের বিভিন্ন রচনার গ্রন্থিমোচনে দেরিদা কত সনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত। দেরিদা সমস্ত গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করেছেন ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। তাঁর মতে এ ছাড়া কোনো দার্শনিক বক্তব্যই বোঝা যায় না। ('It is a mistake to believe in the ahistorical legibility of a philosophical argument'. Margins, পৃ. 188, Alan Bass-এর ইংরেজি অনুবাদ)। তাই তাঁর যে কোনো গ্রন্থভাষ্যে আমরা পরিচয় পেয়েছি এক প্রখর ও উজ্জ্বল ইতিহাসবোধের। উদাহরণ স্বরূপ, হুসার্ল সম্পর্কে তাঁর আলোচনাটির কথা ধরা যাক। হুসার্ল তাঁর Ideas গ্রন্থে দাবি করেন, তাঁর ফেনোমেনোলজি দর্শনের ইতিহাসের শেষ পরিণতি; যে অভীষ্ট নিয়ে দর্শন-ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে তা সমে এসে পৌঁছেছে তাঁর ফেনোমেনোলজিতে। দেরিদা হুসার্লের এই দাবিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন হুসার্লের অন্যতম অবদান এক 'authentic metaphysics' যেখানে আদর্শ বা সারধর্ম (ideal or essence) তথ্য (factual) থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, এই সারধর্ম দিয়েই আমাদের ব্যক্তি বা বস্তুর জ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতেই নির্ধারণ করি, অথবা প্রতিটি টেবিল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় টেবিলত্ব—এই জাতির মারফত। এই জাতি বা সারধর্ম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন :

'The positing of essence...does not imply any positing of individual existence whatsoever : Pure essential truths do not make the slightest assertion concerning facts.

'Knowledge of essences : independent of all knowledge about Facts. It is a matter of indifference [with regard to the essence] whether such things have ever been given in all experience' (Ideas 8, W. R. Boyce-Gibson-এর ইংরেজি অনুবাদ)।

Essence-এর সঙ্গে ও Fact-এর এই বিযুক্তিকরণের অভিপ্রায় নিয়ে গ্রিক দর্শন সত্তার (reality) স্বরূপ অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছে বলেই দেরিদা হুসার্লকে ধরবার চেষ্টা করেছেন গ্রিক দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের অনুষঙ্গে। এই অ্যারিস্টটল দেরিদার বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। 'The Supplement of Copula', 'Ousia and Gramme' ইত্যাদি প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করি দেরিদার ইতিহাস-চেতনা, অ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যে চিহ্নিত 'general code of metaphysics'-এর প্রতি তাঁর মনোযোগ। তাঁর হুসার্ল পাঠ অ্যারিস্টটল পাঠের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর লেখা 'Form and Meaning : A Note on the Phenomenology of Language' প্রবন্ধে আমরা পড়ি :

'Only a form is self-evident, only a form has or is an essence, only a form presents itself as such...Form is presence itself. Formality is whatever aspect of the thing in general presents itself, lets itself be seen, gives itself to be thought...Metaphysical thought...is a thought of Being as form' (Margins, পৃ. 157-58, Alan Bass-এর ইংরেজি অনুবাদ)।

এই presence-এর ধারণাটি দেরিদা নিয়েছেন হাইডেগার থেকে এবং মিলিয়েছেন অ্যারিস্টটলীয় form-এর সঙ্গে। অ্যারিস্টটলের মতে, আকার সত্তার ভিত্তি, কিংবা সত্তা আকারের মধ্যেই বিধৃত। এই আকার উপস্থিত না থাকলে সত্তা নির্বিশেষ, অনির্ধারিত বা অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। আবার এই আকারের উপস্থিতি সত্তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও জ্ঞানের বিষয় করে তোলে। তাই এই আকার বা ফর্ম জ্ঞানবিদ্যা (epistemology) ও তত্ত্ববিদ্যার (Ontology) মধ্যে সংযোগ রচনা করে। জোসেফ ওয়েন্স-এর ভাষায়, 'The Form alone defines the thing' and expresses all the Being in the singular thing...as knowable and definite'. ভিটগেনস্টাইনের প্রথম দিকের চিন্তায়ও আমরা এই অ্যারিস্টটলীয় ফর্মের পুনরাবৃত্তি দেখেছি, বিশেষ করে Tractatus-এ তাঁর 'picture theory'-তে। এই চিত্র-তত্ত্ব আসলে ফর্মেরই তত্ত্ব। কোনো বচন (proposition) সত্তার প্রতিলিপি হতে পারে এ জন্যই যে হাত ও দস্তানার মতো তাদের আকার ও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

এই ফর্মকে কেন্দ্র করে গ্রিক দর্শনে যে যাত্রা শুরু হুসার্লের eidos বা ঘটনা সারতত্ত্বে তার সার্থক পরিসমাপ্তি। বন্ধনীকরণ (apoche) পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন বস্তু জগতের সারার্থ আবিষ্কার—সংক্ষেপে এই হচ্ছে হুসার্লীয় দর্শনের মূলকথা। কিন্তু ফর্মের দিকে কেন এই ঝোঁক? অ্যারিস্টটল থেকে হুসার্ল অবধি সমস্ত দার্শনিকদের? কারণ একটিই। দর্শনকে কাল ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। সংগ্রাম একটিই: কালের যাত্রার বিরুদ্ধে—যার রথ নিত্যই উধাও। ফর্মকে গুরুত্ব দিয়ে এই সব দার্শনিকরা রচনা করেন এক র‍্যাশনাল অর্ডার যা সমস্ত বাস্তব, সমস্ত কনটিনজেন্সির অনিশ্চয়তা, সমস্ত বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে ছাড়িয়ে যায়। তাই এঁদের তত্ত্বে যা মুখ্য হয়ে উঠে আসে তা হচ্ছে কালোত্তীর্ণ ফর্ম, যা গৌণ হয়ে পড়ে তা হচ্ছে কাল, পরিবর্তনের ধারা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই পরিবর্তন কি স্বীকৃতি পায়নি, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে? তিনি কি বলেন নি, কালের মধ্যেই আকার বিকশিত হয়ে ওঠে, প্রস্ফুটিত হয়? পোটেনশিয়ালিটি ও অ্যাকচুয়ালিটির কথা বলে আসলে অ্যারিস্টটল এই বর্ধন বা পরিবর্তনের ধারাটির উপরই জোর দিয়েছেন। দুটি গাছের দুটি বীজের কথা ধরা যাক—যারা এমন অবস্থায় আছে যে কোন বীজ থেকে কোন গাছ জন্ম নেবে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবু এ কথা নিশ্চিত যে এই দুটি বীজের মধ্যে একটি থেকে ওক গাছ হবে, অন্য বীজ থেকে অপর একটি গাছ। অন্য ভাষায় বলা যায়, ওক গাছের বীজ যদিও বাস্তব ওকে পরিণত হয়নি, তবু সেই বীজের মধ্যে সুপ্তাকারে রয়েছে ভবিষ্যত ওক গাছের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সেই বীজটি কালক্রমে ওক হয়ে উঠবে, এবং কখনই অন্য কোনো গাছ হবে না। সুতরাং পরিবর্তন বা বর্ধন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রবণতা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। কিংবা এ কথাও বলা যায় বস্তুর প্রচ্ছন্ন আকার পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্য কালের প্রয়োজন। কাজেই অ্যারিস্টটল কাল বা পরিবর্তনের কথা বলেননি এমন নয়। তবু কিন্তু সংশয় থেকে যায়। তবু বলা যায়, অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে প্রধান হয়ে ওঠে ফর্ম, পরিবর্তন যাকে স্পর্শ করতে পারে না, পরিবর্তন যার অমোঘ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। তাঁর তত্ত্বে উপেক্ষিত হয় কালের নিজস্ব স্পন্দন, অনিশ্চিত সম্ভাবনা। অ্যারিস্টটল সর্বদাই 'অ্যাকসিডেন্ট'-এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেন। তিনি বলেন, এই অ্যাকসিডেন্ট বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত নয়: এখানে প্রশ্রয় পায় নিয়মহীন ব্যত্যয়, এখানে সব কিছুই এলোমেলো, অনিয়মিত, দুর্বোধ্য। বৌদ্ধিক বৃত্তের বাইরে অধিষ্ঠিত এই অ্যাক্সিডেন্টকে তুচ্ছ করার অর্থই হচ্ছে কালের মহিমাকে তুচ্ছ করা। সেন্ট অগস্টাইনের ভাষায়, 'Being of time tends not to be!'

হাইডেগার অবশ্য ফর্মের অনৈতিহাসিক উপস্থিতির সঙ্গে ইতিহাস ও কালের একটি

সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন 'disclosure' কথাটি ব্যবহার করে। বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা অস্বীকার করে একমাত্র ঐক্য বা identity-কে গুরুত্ব দেবার পেছনে যে গভীরতর অসুখ নিহিত আছে সে সম্পর্কে হাইডেগার অবহিত। তাই তিনি এক সাযুজ্য রচনার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, সত্তার সংগঠনের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে বিভিন্ন রূপ। এই বিভিন্ন রূপ একমাত্র মানুষের কাছেই অনাবৃত, প্রকাশিত হয় বিভিন্নকালে। সত্তার এই প্রকাশ বা disclosure mode-এর মধ্যেই কাল তার নিজস্ব মহিমা ও দীপ্তিতে প্রকাশ পায়, আর এইভাবে তৈরি হতে থাকে এক সেতু—কাল এবং সত্তার সুপ্ত আকার বা সংগঠনের মধ্যে।

এই হাইডেগারীয় প্রয়াসে দেরিদা অবশ্য একেবারেই সন্তুষ্ট নন। এই মেলবন্ধন তাঁর মতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাঁর যুক্তি, হাইডেগারের দর্শনে কালের কোনো যথার্থ ভূমিকা নেই; সে শুধু সত্তার মধ্যে ন্যস্ত বিভিন্ন আকারকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করে মাত্র, আর কিছু নয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

'If Heidegger has radically deconstructed the domination of metaphysics by the present, he has done so in order to lead us to think the presence of the present' (Margins, পৃ. 131)।

দেরিদার অবনির্মিতির লক্ষ্য ফর্মের বর্মে প্রতিহত কালের পুনরুদ্ধার। তিনি তুলে ধরেন কালের স্বাতন্ত্র্য তার অনিশ্চয়তা। এর অর্থ এই নয়, আকার নিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধি গ্রাহ্য সত্তার ঐক্যকে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি শুধু বলেন, এই ঐক্যের মধ্যে লগ্ন হয়ে থাকেপারি বর্তন, কনটিনজেন্সি; এই ঐক্যের মধ্যে নিহিত থাকে নিত্য নব রূপান্তরের সম্ভাবনা, যাকে তিনি বলেছেন, 'play of differences'.□